দুই বোন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচিপত্র

শর্মিলা 2

নীরদ 16

শর্মিলা

মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।

এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।

শশাঙ্কের স্ত্রী শর্মিলা মায়ের জাত।

বড়ো বড়ো শান্ত চোখ; ধীর গভীর চাহনি; জলভরা নবমেঘের মতো নধর দেহ, স্নিগ্ধ শ্যামল; সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণরেখা; শাড়ির কালো পাড়টি প্রশস্ত; দুই হাতে মকরমুখো মোটা দুই বালা, সেই ভূষণের ভাষা প্রসাধনের ভাষা নয়, শুভসাধনের ভাষা।

স্বামীর জীবনলোকে এমন কোনো প্রত্যন্তদেশ নেই যেখানে তার সাম্রাজ্যের প্রভাব শিথিল। স্ত্রীর অতিলালনের আওতায় স্বামীর মন হয়ে পড়েছে অসাবধান। ফাউন্টেন কলমটা সামান্য দুর্যোগে টেবিলের কোনো অনতিলক্ষ্য অংশে ক্ষণকালের জন্যে অগোচর হলে সেটা পুনরাবিষ্কারের ভার স্ত্রীর ’পরে। স্নানে যাবার পূর্বে হাতঘড়িটা কোথায়

ফেলেছে শশাঙ্কর হঠাৎ সেটা মনে পড়ে না, স্ত্রীর সেটা নিশ্চিত চোখে পড়ে। ভিন্ন রঙের দু-জোড়া মোজার এক-এক পাটি এক-এক পায়ে পরে বাইরে যাবার জন্যে যখন সে প্রস্তুত, স্ত্রী এসে তার প্রমাদ সংশোধন করে দেয়। বাংলা মাসের সঙ্গে ইংরেজি মাসের তারিখ জোড়া দিয়ে বুদের নিমন্ত্রণ করে, তার পরে অকালে অপ্রত্যাশিত অতিথিসমাগমের আকস্মিক দায় পড়ে স্ত্রীর উপর। শশাঙ্ক নিশ্চয় জানে দিনযাত্রায় কোথাও ত্রুটি ঘটলেই স্ত্রীর হাতে তার সংস্কার হবেই, তাই ত্রুটি ঘটানোই তার স্বভাব হয়ে পড়েছে। স্ত্রী সস্নেহ তিরস্কারে বলে, "আর তো পারি নে। তোমার কি কিছুতেই শিক্ষা হবে না!" যদি শিক্ষা হত তবে শর্মিলার দিনগুলো হত অনাবাদি ফসলের জমির মতো।

শশাঙ্ক হয়তো বন্ধুমহলে নিমন্ত্রণে গেছে। রাত এগারোটা হল, দুপুর হল, ব্রিজ খেলা চলছে। হঠাৎ বন্ধুরা হেসে উঠল, "ওহে, তোমার সমনজারির পেয়াদা। সময় তোমার আসন্ন।"

সেই চিরপরিচিত মহেশ চাকর। পাকা গোঁফ, কাঁচা মাথার চুল, গায়ে মেরজাই পরা, কাঁধে রঙিন ঝাড়ন, বগলে বাঁশের লাঠি। মাঠাকরুন খবর নিতে পাঠিয়েছেন বাবু কি আছেন এখানে? মাঠাকরুনের ভয়, পাছে ফেরবার পথে অন্ধকার রাতে দুর্যোগ ঘটে। সঙ্গে একটা লণ্ঠনও পাঠিয়েছেন।

শশাঙ্ক বিরক্ত হয়ে তাস ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। বন্ধুরা বলে, "আহা, একা অরক্ষিত পুরুষমানুষ।" বাড়ি ফিরে এসে শশাঙ্ক স্ত্রীর সঙ্গে যে আলাপ করে সেটা না স্নিগ্ধ ভাষায় না শান্ত ভঙ্গিতে। শর্মিলা চুপ করে ভৎর্সনা মেনে নেয়। কী করবে, পারে না থাকতে। যতপ্রকার অসম্ভব বিপত্তি ওর অনুপস্থিতির অপেক্ষায় স্বামীর পথে ষড়যন্ত্র করে, এ আশঙ্কা ও কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না।

বাইরে লোক এসেছে, হয়তো কাজের কথায়। ক্ষণে ক্ষণে অন্তঃপুর থেকে ছোটো ছোটো চিরকুট আসছে, "মনে আছে কাল তোমার অসুখ করেছিল? আজ সকাল সকাল খেতে এসো।" রাগ করে শশাঙ্ক, আবার হারও মানে। বড়ো দুঃখে একবার স্ত্রীকে বলেছিল, "দোহাই তোমার, চক্রবর্তীবাড়ির গিন্নীর মতো একটা ঠাকুরদেবতা আশ্রয় করো। তোমার মনোযোগ আমার একলার পক্ষে বেশি। দেবতার সঙ্গে সেটা ভাগাভাগি করে নিতে পারলে সহজ হয়। যতই বাড়াবাড়ি করো দেবতা আপত্তি করবেন না, কিন্তু মানুষ যে দুর্বল।"

শর্মিলা বললে, "হায় হায়, একবার কাকাবাবুর সঙ্গে যখন হরিদ্বার গিয়েছিলুম, মনে আছে তোমার অবস্থা।"

অবস্থাটা যে অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছিল এ কথা শশাঙ্কই প্রচুর অলংকার দিয়ে একদা স্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যা করেছে। জানত এই অত্যুক্তিতে শর্মিলা যেমন অনুতপ্ত তেমনি আনন্দিত হবে। আজ সেই অমিতভাষণের প্রতিবাদ করবে কোন্ মুখে। চুপ করে মেনে যেতে হল, শুধু তাই নয়, সেদিনই ভোরবেলায় অল্প একটু যেন সর্দির আভাস দেখা দিয়েছে, শর্মিলার এই কল্পনা অনুসারে তাকে কুইনিন খেতে হল দশ গ্রেন, তা ছাড়া তুলসীপাতার রস দিয়ে চা। আপত্তি করবার মুখ ছিল না। কারণ ইতিপূর্বে অনুরূপ অবস্থায় আপত্তি করেছিল, কুইনিন খায় নি, জ্বরও হয়েছিল, এই বৃত্তান্তটি শশাঙ্কের ইতিহাসে অপরিমোচনীয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

ঘরে আরোগ্য ও আরামের জন্যে শর্মিলার এই যেমন সস্নেহ ব্যগ্রতা, বাইরে সম্মান রক্ষার জন্যে তার সতর্কতা তেমনি সতেজ। একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে।

একবার বেড়াতে গিয়েছিল নৈনিতালে। আগে থাকতে সমস্ত পথ কামরা ছিল রিজার্ভ-করা। জংশনে এসে গাড়ি বদলিয়ে আহারের সন্ধানে গেছে। ফিরে এসে দেখে উর্দিপরা

দুর্জন মূর্তি ওদের কামরা বেদখল করবার উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত। স্টেশনমাস্টার এসে এক বিশ্ববিশ্রুত জেনেরালের নাম করে বললে, কামরাটা তাঁরই, ভুলে অন্য নাম খাটানো হয়েছে। শশাঙ্ক চক্ষু বিস্ফারিত করে সসম্ভ্রমে অন্যত্র যাবার উপক্রম করছে, হেনকালে শর্মিলা গাড়িতে উঠে দরজা আগলিয়ে বললে, "দেখতে চাই কে আমাকে নামায়। ডেকে আনো তোমার জেনেরালকে।" শশাঙ্ক তখনো সরকারি কর্মচারী, উপরওআলার জ্ঞাতিগোত্রকে যথোচিত পাশ কাটিয়ে নিরাপদ পথে চলতে সে অভ্যস্ত। সে ব্যস্ত হয়ে যত বলে, "আহা, কাজ কী, আরো তো গাড়ি আছে"- শর্মিলা কানই দেয় না! অবশেষে জেনেরালসাহেব রিফ্রেশমেন্ট রুমে আহার সমাধা করে চুরুট মুখে দূর থেকে স্ত্রীমূর্তির উগ্রতা দেখে গেল হটে। শশাঙ্ক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, "জান কতবড়ো লোকটা।" স্ত্রী বললে, "জানার গরজ নেই। যে-গাড়িটা আমাদের, সে-গাড়িতে ও তোমার চেয়ে বড়ো নয়।"

শশাঙ্ক প্রশ্ন করলে, "যদি অপমান করত?"

শর্মিলা জবাব দিলে, "তুমি আছ কী করতে।"

শশাঙ্ক শিবপুরে পাস-করা এঞ্জিনিয়ার। ঘরের জীবনযাত্রায় শশাঙ্কের যতই ঢিলেমি থাক্ চাকরির কাজে সে পাকা। প্রধান কারণ, কর্মস্থানে যে তুঙ্গী গ্রহের নির্মম দৃষ্টি সে হচ্ছে যাকে চলতি ভাষায় বলে বড়োসাহেব। স্ত্রীগ্রহ সে নয়। শশাঙ্ক ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারি পদে যখন অ্যাকটিনি করছে এমন সময় আসন্ন উন্নতির মোড় ফিরে গেল উলটো দিকে। যোগ্যতা ডিঙিয়ে কাঁচা অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যে ইংরেজ যুবক বিরল গুম্ফরেখা নিয়ে তার আসন দখল করলে, কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্তার সম্পর্ক ও সুপারিশ বহন করে তার এই অভাবনীয় আবির্ভাব।

শশাঙ্ক বুঝে নিয়েছে, এই অর্বাচীনকে উপরের আসনে বসিয়ে নীচের স্তরে থেকে তাকেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। কর্তৃপক্ষ পিঠে চাপড় মেরে বললে, "ভেরি সরি মজুমদার, তোমাকে যত শীঘ্র পারি উপযুক্ত স্থান জুটিযে দেব।" এরা দুজনেই এক ফ্রীমেসন লজের অন্তর্ভুক্ত।

তবু আশ্বাস ও সান্ত্বনা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারটা মজুমদারের পক্ষে অত্যন্ত বিস্বাদ হয়ে উঠল। ঘরে এসে ছোটোখাটো সব বিষয়ে খিটখিট শুরু করে দিলে। হঠাৎ চোখে পড়ল তার আপিসঘরের এককোণে ঝুল, হঠাৎ মনে হল চৌকির উপরে যে সবুজ রঙের ঢাকাটা আছে সে-রঙটা ও দু-চক্ষে দেখতে পারে না। বেহারা বারান্দা ঝাড় দিচ্ছিল, ধুলো উড়ছে বলে তাকে দিল একটা প্রকাণ্ড ধমক। অনিবার্য ধুলো রোজই ওড়ে কিন্তু ধমকটা সদ্য নূতন।

অসম্মানের খবরটা স্ত্রীকে জানালে না। ভাবলে যদি কানে ওঠে তা হলে চাকরির জালটাতে আরো একটি গ্রন্থি পাকিয়ে তুলবে- হয়তো বা স্বয়ং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে আসবে অমধুর ভাষায়। বিশেষত ঐ ডোনাল্ডসনের উপর তার রাগ আছে। একবার সে সার্কিট-হাউসের বাগানে বাঁদরের উৎপাত দমন করতে গিয়ে ছর্‌রা-গুলিতে শশাঙ্কর সোলার টুপি ফুটো করে দিয়েছে। বিপদ ঘটে নি কিন্তু ঘটতে তো পারত। লোকে বলে দোষ শশাঙ্করই, শুনে তার রাগ আরো বেড়ে ওঠে ডোনাল্ডসনের 'পরেই। সকলের চেয়ে রাগের কারণটা এই, বাঁদরকে লক্ষ্য-করা গুলি শশাঙ্কের উপর পড়াতে শত্রুপক্ষ এই দুটো ব্যাপারের সমীকরণ করে উচ্চহাস্য করেছে।

শশাঙ্কের পদলাঘবের খবরটা শশাঙ্কের স্ত্রী স্বয়ং আবিষ্কার করলে। স্বামীর রকম দেখেই বুঝেছিল সংসারে কোনো দিক থেকে একটা কাঁটা উচিয়ে উঠেছে। তার পরে কারণ বের

করতে সময় লাগে নি। কনস্টিট্যুশনাল অ্যাজিটেশনের পথে গেল না, গেল সেল্‌ফ-ডিটার্মিনেশনের অভিমুখে। স্বামীকে বললে, “আর নয়, এখনই কাজ ছেড়ে দাও।”

দিতে পারলে অপমানের জোঁকটা বুকের কাছ থেকে খসে পড়ে। কিন্তু ধ্যানদৃষ্টির সামনে প্রসারিত রয়েছে বাঁধা মাইনের অন্নক্ষেত্র, এবং তার পশ্চিমদিগন্তে পেনসনের অবিচলিত স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা।

শশাঙ্কমৌলী যে-বছরে এম এসসি ডিগ্রির সর্বোচ্চ শিখরে সদ্য অধিরূঢ়, সেই বছরেই তার শ্বশুর শুভকর্মে বিলম্ব করেন নি- শশাঙ্কের বিবাহ হয়ে গেল শর্মিলার সঙ্গে। ধনী শ্বশুরের সাহায্যেই এঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে। তার পরে চাকরিতে দ্রুত উন্নতির লক্ষণ দেখে রাজারামবাবু জামাতার ভাবী সচ্ছলতার ক্রমবিকাশ নির্ণয় করে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। মেয়েটিও আজ পর্যন্ত অনুভব করে নি তার অবস্থান্তর ঘটেছে। শুধু যে সংসারে অনটন নেই তা নয়, বাপের বাড়ির চালচলন এখানেও বজায় আছে। তার কারণ, এই পারিবারিক দ্বৈরাজ্যে ব্যবস্থাবিধি শর্মিলার অধিকারে। ওর সন্তান হয় নি, হবার আশাও বোধ করি ছেড়েছে। স্বামীর সমস্ত উপার্জন অখণ্ডভাবে এসে পড়ে ওরই হাতে। বিশেষ প্রয়োজন ঘটলে ঘরের অন্নপূর্ণার কাছে ফিরে ভিক্ষা না মেগে শশাঙ্কর উপায় নেই। দাবি অসংগত হলে নামঞ্জুর হয়, মেনে নেয় মাথা চুলকিয়ে। অপর কোনো দিক থেকে নৈরাশ্যটা পূরণ হয় মধুর রসে।

শশাঙ্ক বললে, “চাকরি ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়। তোমার জন্যে ভাবি, কষ্ট হবে তোমারই।”

শর্মিলা বললে, “তার চেয়ে কষ্ট হবে যখন অন্যায়টাকে গিলতে গিয়ে গলায় বাধবে।”

শশাঙ্ক বললে, “কাজ তো করা চাই, ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবকে খুঁজে বেড়াব কোন্‌ পাড়ায়।”

"সে-পাড়া তোমার চোখে পড়ে না। তুমি যাকে ঠাট্টা করে বল তোমার চাকরির লুচি-স্থান, বেলুচিস্থান মরুপ্রদেশের ও পারে, তার বাইরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুমি গণ্যই কর না।"

"সর্বনাশ। সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে মস্ত প্রকাণ্ড। রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরোবে কে। অতবড়ো দূরবীন পাই কোন্ বাজারে।"

"মস্ত দূরবীন তোমাকে কষতে হবে না। আমার জ্ঞাতিসম্পর্কের মথুরদাদা কলকাতার বড়ো কন্ট্রাক্টর, তাঁর সঙ্গে ভাগে কাজ করলে দিন চলে যাবে।"

"ভাগটা ওজনে অসমান হবে। এ পক্ষে বাটখারায় কমতি। খুঁড়িয়ে শরিকি করতে গেলে পদমর্যাদা থাকবে না।"

"এ পক্ষে কোনো অংশেই কমতি নেই। তুমি জানো, বাবা আমার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখে গেছেন, সুদে বাড়ছে। শরিকের কাছে তোমাকে খাটো হতে হবে না।"

"সে কি হয়। ও টাকা যে তোমার।" বলে শশাঙ্ক উঠে পড়ল। বাইরে লোক বসে আছে। শর্মিলা স্বামীর কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে বললে, "আমিও যে তোমারই।"

তার পর বললে, "বের করো তোমার জেব থেকে ফাউন্টেন্‌পেন, এই নাও চিঠির কাগজ, লেখো রেজিগ্‌নেশন-পত্র। সেটা ডাকে রওনা না করে আমার শান্তি নেই।"

"আমারও শান্তি নেই বোধ হচ্ছে।"

লিখলে রেজিগ্‌নেশন-পত্র।

পরদিনই শর্মিলা চলে গেল কলকাতায়, উঠল গিয়ে মথুরদাদার বাড়িতে। অভিমান করে বললে, "একদিনও তো বোনের খবর নাও না।"

মেয়ে-প্রতিদ্বন্দ্বী হলে বলত, 'তুমিও তো নাও না।' পুরুষের মাথায় সে জবাব জোগাল না। অপরাধ মেনে নিলে। বললে, "নিশ্বাস ফেলবার কি সময় আছে। নিজে আছি কি না তাই ভুল হয়ে যায়। আর, তা ছাড়া তোমরাও তো দূরে দূরে বেড়াও।"

শর্মিলা বললে, “কাগজে দেখলুম ময়ুরভ না মথুরগ কোথায় একটা ব্রিজ তৈরির কাজ পেয়েছ। পড়ে এত খুশি হলুম। তখনই মনে হল মথরদাদাকে নিজে গিয়ে কন্‌গ্রাচুলেট করে আসি।”

“একটু সবুর কোরো খুকি। এখনো সময় হয় নি।”

ব্যাপারখানা এইঃ নগদ টাকা ফেলার দরকার। মাড়োয়ারি ধনীর সঙ্গে ভাগে কাজ করার কথা। শেষকালে প্রকাশ হল, যেরকম শর্ত তাতে শাঁসের ভাগটাই মাড়োয়ারির আর ছিবড়ের ভাগটাই পড়বে ওর কপালে। তাই পিছোবার চেষ্টা।

শর্মিলা ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, “এ কখনো হতেই পারে না। ভাগে কাজ করতে যদি হয় আমাদের সঙ্গে করো। এমন কাজটা তোমার হাত থেকে ফসকে গেলে ভারি অন্যায় হবে। আমি থাকতে এ হতেই দেব না, যাই বল তুমি।”

এর পরে লেখাপড়া হতেও দেরি হল না; মথুরদাদার হৃদয়ও বিগলিত হল।

ব্যাবসা চলল বেগে। এর আগে চাকরির দায়িত্বে শশাঙ্ক কাজ করেছে, সে দায়িত্বের সীমা ছিল পরিমিত। মনিব ছিল নিজের বাইরে, দাবি এবং দেয় সমান সমান ওজন মিলিয়ে চলত। এখন নিজেরই প্রভুত্ব নিজেকে চালায়। দাবি এবং দেয় এক জায়গায় মিলে গেছে। দিনগুলো ছুটিতে কাজেতে জাল-বোনা নয়, সময়টা হয়েছে নিরেট। যে দায়িত্ব ওর মনের উপর চেপে, সেটাকে ইচ্ছে করলেই ত্যাগ করা যায় বলেই তার জোর এত কড়া। আর কিছু নয়, স্ত্রীর ঋণ শুধতেই হবে, তার পরে ধীরে সুস্থে চলবার সময় পাওয়া যাবে। বাঁ হাতের কব্জিতে ঘড়ি, মাথায় সোলার টুপি, আস্তিন গোটানো, খাকির প্যান্ট পরা, চামড়ার কোমরব আঁটা, মোটা-সুক্‌তলা-ওআলা জুতো, চোখে রোদ বাঁচাবার রঙিন চশমা- শশাঙ্ক উঠেপড়ে লেগে গেল কাজে। স্ত্রীর ঋণ যখন শোধ হবার কিনারায় এল তখনো ইস্টিমের দম কমায় না, মনটা তখন উঠেছে গরম হয়ে।

ইতিপূর্বে সংসারে আয়ব্যয়ের ধারাটা বইত একই খাদে, এখন হল দুই শাখা। একটা গেল ব্যাঙ্কের দিকে, আর-একটা ঘরের দিকে। শর্মিলার বরাদ্দ পূর্বের মতোই আছে, সেখানকার দেনাপাওনার রহস্য শশাঙ্কর অগোচরে। আবার ব্যবসায়ের ঐ চামড়া-বাঁধানো হিসেবের খাতাটা শর্মিলার পক্ষে দুর্গম দুর্গবিশেষ। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু স্বামীর ব্যবসায়িক জীবনের কক্ষপথ ওর সংসারচক্রের বাইরে পড়ে যাওয়াতে সেই দিক থেকে ওর বিধিবিধান উপেক্ষিত হতে থাকে। মিনতি করে বলে, 'বাড়াবাড়ি কোরো না, শরীর যাবে ভেঙে।' কোনো ফল হয় না। আশ্চর্য এই, শরীরও ভাঙছে না। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্‌বেগ, বিশ্রামের অভাব নিয়ে আক্ষেপ, আরামের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ততা ইত্যাদি শ্রেণীর দাম্পত্যিক উৎকণ্ঠা সবেগে উপক্ষো করে শশাঙ্ক সক্কালবেলায় সেকেন্ড্‌হ্যান্ড্ ফোর্ডগাড়ি নিজে হাঁকিয়ে শিঙে বাজিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেলা দুটো-আড়াইটার সময় ঘরে ফিরে এসে বকুনি খায়, এবং আর-আর খাওয়াও দ্রুত হাত চালিয়ে শেষ করে।

একদিন ওর মোটরগাড়ির সঙ্গে আর-কার গাড়ির ধাক্কা লাগল। নিজে গেল বেঁচে, গাড়িটা হল জখম, পাঠিয়ে দিল তাকে মেরামত করতে। শর্মিলা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। বাষ্পাকুলকণ্ঠে বললে, "গাড়ি তুমি নিজে হাঁকাতে পারবে না।"

শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললে, "পরের হাতের আপদও একই জাতের দুশমন।"

একদিন কোন্ মেরামতের কাজ তদন্ত করতে গিয়ে জুতো ফুঁড়ে পায়ে ফুটল ভাঙা প্যাকবাক্সর পেরেক, হাঁসপাতালে গিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে ধনুষ্টংকারের টিকে নিলে, সেদিন কান্নাকাটি করলে শর্মিলা; বললে, "কিছুদিন থাকো শুয়ে।"

শশাঙ্ক অত্যন্ত সংক্ষেপে বললে, "কাজ।" এর চেয়ে বাক্য আর সংক্ষেপ করা যায় না।

শর্মিলা বললে, "কিন্তু"- এবার বিনা বাক্যেই ব্যান্ডেজসুদ্ধ চলে গেল কাজে।

জোর খাটাতে আর সাহস হয় না। আপন ক্ষেত্রে পুরুষের জোর দেখা দিয়েছে। যুক্তিতর্ক-কাকুতিমিনতির বাইরে একটিমাত্র কথা- 'কাজ আছে।' শর্মিলা অকারণে উদ্‌বিগ্ন হয়ে বসে থাকে। দেরি হলেই ভাবে মোটরে বিপদ ঘটেছে। রোদ্‌দুর লাগিয়ে স্বামীর মুখ যখন দেখে রক্তবর্ণ, মনে করে নিশ্চয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ভয়ে ভয়ে আভাস দেয় ডাক্তারের- স্বামীর ভাবখানা দেখে ঐখানেই থেমে যায়। মন খুলে উদ্‌বেগ প্রকাশ করতেও আজকাল ভরসা হয় না।

শশাঙ্ক দেখতে দেখতে রোদে-পোড়া খট্‌খটে হয়ে উঠেছে। খাটো আঁট কাপড়, খাটো আঁট অবকাশ, চালচলন দ্রুত, কথাবার্তা স্ফুলিঙ্গের মতো সংক্ষিপ্ত। শর্মিলার সেবা এই দ্রুতলয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চেষ্টা করে। স্টোভের কাছে কিছু খাবার সর্বদাই গরম রাখতে হয়, কখন স্বামী হঠাৎ অসময়ে বলে বসে, 'চললুম, ফিরতে দেরি হবে।' মোটরগাড়িতে গোছানো থাকে সোডাওয়াটার এবং ছোটো টিনের বাক্সে শুকনোজাতের খাবার। একটা ওডিকোলনের শিশি বিশেষ দৃষ্টগোচররূপেই রাখা থাকে, যদি মাথা ধরে। গাড়ি ফিরে এলে পরীক্ষা করে দেখে কোনোটাই ব্যবহার করা হয় নি। মন খারাপ হয়ে যায়। সাফ কাপড় শোবার ঘরে প্রত্যহই সুপ্রকাশ্যভাবে ভাঁজ করা, তৎসত্ত্বেও অন্তত সপ্তাহে চার দিন কাপড় ছাড়বার অবকাশ থাকে না। ঘরকন্নার পরামর্শ খুবই খাটো করে আনতে হয়েছে, জরুরি টেলিগ্রামের ঠোকর-মারা ভাষার ধরনে, সেও চলতে চলতে পিছু ডাকতে ডাকতে, বলতে বলতে 'ওগো শুনে যাও কথাটা।' ওদের ব্যাবসার মধ্যে শর্মিলার যে একটুখানি যোগ ছিল তাও গেল কেটে, ওর টাকাটা এসেছে সুদে আসলে শোধ হয়ে। সুদও দিয়েছে মাপজোখ-করা হিসেবে, দস্তুরমত রসিদ নিয়ে। শর্মিলা বলে, 'বাস রে, ভালোবাসাতেও পুরুষ আপনাকে সবটা মেলাতে পারে না। একটা জায়গা ফাঁকা রাখে, সেইখানটাতে ওদের পৌরুষের অভিমান।'

লাভের টাকা থেকে শশাঙ্ক মনের মতো বাড়ি খাড়া করেছে ভবানীপুরে। ওর শখের জিনিস। স্বাস্থ্য আরাম শৃঙ্খলার নতুন নতুন প্ল্যান আসছে মাথায়। শর্মিলাকে আশ্চর্য করবার চেষ্টা। শর্মিলাও বিধিমত আশ্চর্য হতে ত্রুটি করে না। এঞ্জিনিয়ার একটা কাপড়-কাচা কলের পত্তন করেছে, শর্মিলা সেটাকে ঘুরে ফিরে দেখে খুব তারিফ করলে। মনে মনে বললে, 'কাপড় আজও যেমন ধোবার বাড়ি যাচ্ছে কালও তেমনি যাবে। ময়লা কাপড়ের গর্দভবাহনকে বুঝে নিয়েছি, তার বিজ্ঞানবাহনকে বুঝি নে।' আলুর খোসা ছাড়াবার যন্ত্রটা দেখে তাক লেগে গেল, বললে, 'আলুর দম তৈরি করবার বারো-আনা দুঃখ যাবে কেটে।' পরে শোনা গেছে সেটা ফুটো ডেকচি ভাঙা কাৎলি প্রভৃতির সঙ্গে এক বিস্মৃতিশয্যায় নৈষ্কর্ম্য লাভ করেছে।

বাড়িটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন এই স্থাবর পদার্থটার প্রতি শর্মিলার রুদ্ধ স্নেহের উদ্যম ছাড়া পেলে। সুবিধা এই যে, ইটকাঠের দেহটাতে ধৈর্য অটল। গোছানো-গাছানো সাজানো-গোজানোর মহোদ্যমে দুই-দুইজন বেহারা হাঁপিয়ে উঠল, একজন দিয়ে গেল জবাব। ঘরগুলোর গৃহসজ্জা চলছে শশাঙ্ককে লক্ষ্য করে। বৈঠকখানাঘরে সে আজকাল প্রায়ই বসে না, তবু তারই ক্লান্ত মেরুদণ্ডের উদ্দেশে কুশন নিবেদন করা হচ্ছে নানা ফ্যাশনের; ফুলদানি একটা-আধটা নয়, টিপায়ে টেবিলে ঝালরওআলা ফুলকাটা আবরণ। শোবার ঘরে দিনের বেলায় শশাঙ্কর সমাগম আজকাল বন্ধ, কেননা তার আধুনিক পঞ্জিকায় রবিবারটা সোমবারেরই যমজ ভাই। অন্য ছুটিতে কাজ যখন বন্ধ তখনো ছুটোছাটা কাজ কোথা থেকে সে খুঁজে বের করে, আপিস-ঘরে গিয়ে প্ল্যান আঁকবার তেলা কাগজ কিংবা খাতাপত্র নিয়ে বসে। তবু সাবেক কালের নিয়ম চলছে। মোটা গদিওআলা সোফার সামনে প্রস্তুত থাকে পশমের চটিজোড়া। সেখানে পানের বাটায় আগেকার মতোই পান থাকে সাজা, আলনায় থাকে পাতলা সিল্কের পাঞ্জাবি, কোঁচানো

ধুতি। আপিস-ঘরটাতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসের দরকার, তবু শশাঙ্কের অনুপস্থিতি-কালে ঝাড়ন হাতে শর্মিলা সেখানে প্রবেশ করে। সেখানকার রক্ষণীয় এবং বর্জনীয় বস্তু-ব্যূহের মধ্যে সজ্জা ও শৃঙ্খলার সমন্বয়-সাধনে তার অধ্যবসায় অপ্রতিহত।

শর্মিলা সেবা করছে, কিন্তু আজকাল সেই সেবার অনেকখানি অগোচরে। আগে তার যে আত্মনিবেদন ছিল প্রত্যক্ষের কাছে এখন তার প্রয়োগটা প্রতীকে- বাড়িঘর সাজানোয়, বাগান করায়, যে চৌকিতে শশাঙ্ক বসে তারই রেশমের ঢাকায়, বালিশের ওয়াড়ের ফুলকাটা কাজে, আপিসের টেবিলের কোণে রজনীগার গুচ্ছে সজ্জিত নীল স্ফটিকের ফুলদানিতে।

নিজের অর্ঘ্যকে পূজাবেদীর থেকে দূরে স্থাপন করতে হল, কিন্তু অনেক দুঃখে। এই অল্পদিন আগেই যে ঘা পেয়েছে তার চিহ্ন গোপনে চোখের জল ফেলে ফেলে মুছতে হয়েছে। সেদিন উনত্রিশে কার্তিক, শশাঙ্কের জন্মদিন। শর্মিলার জীবনে সব চেয়ে বড়ো পরব। যথারীতি বুবাবদের নিমন্ত্রণ করা হল, ঘরদুয়োর বিশেষ করে সাজানো হয়েছে ফুলে পাতায়।

সকালের কাজ সেরে শশাঙ্ক বাড়ি ফিরে এসে বললে, "এ কী ব্যাপার। পুতুলের বিয়ে নাকি।"

"হায় রে কপাল, আজ তোমার জন্মদিন, সে কথাটাও ভুলে গেছ? যাই বল, বিকেলে কিন্তু তুমি বেরোতে পারবে না।"

"বিজ্‌নেস মৃত্যুদিন ছাড়া আর কোনো দিনের কাছে মাথা হেঁট করে না।"

"আর কখনো বলব না। আজ লোকজন নেমন্তন্ন করে ফেলেছি।"

"দেখো শর্মিলা, তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে খেলা করবার চেষ্টা কোরো না" এই বলে শশাঙ্ক দ্রুত চলে গেল। শর্মিলা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ কাঁদলে।

অপরাহ্নে লোকজন এল। বিজ্‌নেসের সর্বোচ্চ দাবি তারা সহজেই মেনে নিলে। এটা যদি হত কালিদাসের জন্মদিন তবে শকুন্তলার তৃতীয় অঙ্ক লেখবার ওজরটাকে সকলেই নিশ্চয় নিতান্ত বাজে বলে ধরে নিত। কিন্তু বিজ্‌নেস! আমোদপ্রমোদ যথেষ্ট হল। নালুবাবু থিয়েটারের নকল করে সবাইকে খুব হাসালেন, শর্মিলাও সে হাসিতে যোগ দিলে। শশাঙ্ক-বিরহিত শশাঙ্কের জন্মদিন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলে শশাঙ্ক-অধিষ্ঠিত বিজ্‌নেসের কাছে।

দুঃখ যথেষ্ট হল, তবু শর্মিলার মনও দূর থেকে প্রণিপাত করলে শশাঙ্কের এই ধাবমান কাজের রথের ধ্বজাটাকে। ওর কাছে সেই দুরধিগম্য কাজ, যা কারও খাতির করে না, স্ত্রীর মিনতিকে না, বুর নিমন্ত্রণকে না, নিজের আরামকে না। এই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা পুরুষমানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করে, এ তার আপন শক্তির কাছে আপনাকে নিবেদন। শর্মিলা ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কর্মধারার পারে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখে তার পরপারে শশাঙ্কের কাজ। বহুব্যাপক তার সত্তা, ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায় সে দূরদেশে, দূর সমুদ্রের পারে, জানা-অজানা কত লোককে টেনে নিয়ে আসে আপন শাসনজালে। নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে পুরুষের প্রতিদিনের সংগ্রাম; তারই বন্ধুর যাত্রাপথে মেয়েদের কোমল বাহু-বন্ধন যদি বাধা ঘটাতে আসে তবে পুরুষ তাকে নির্মম বেগে ছিন্ন করে যাবে বৈকি। এই নির্মমতাকে শর্মিলা ভক্তির সঙ্গেই মেনে নিলে। মাঝে মাঝে থাকতে পারে না, যেখানে অধিকার নেই হৃদয়ের টানে সেখানেও নিয়ে আসে তার সকরুণ উৎকণ্ঠা,

আঘাত পায়, সে আঘাতকে প্রাপ্য গণ্য করেই ব্যথিতমনে পথ ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে। দেবতাকে বলে ‘দৃষ্টি রেখো’, যেখানে তার নিজের গতিবিধি অবরুদ্ধ।

নীরদ

ব্যাঙ্কে-জমা টাকায় সওয়ার হয়ে এ পরিবারের সমৃদ্ধি যে সময়টাতে ছুটে চলেছে ছয় সংখ্যার অঙ্কের দিকে সেই সময়ে শর্মিলাকে ধরল দুর্বোধ কোন্‌-এক রোগে, ওঠবার শক্তি রইল না। এ নিয়ে কেন যে দুর্ভাবনা সে কথাটা বিবৃত করা দরকার।

রাজারামবাবু ছিলেন শর্মিলার বাপ। বরিশাল অঞ্চলে এব গঙ্গার মোহনার কাছে তাঁর অনেকগুলি মস্ত জমিদারি। তা ছাড়া জাহাজ-তৈরির ব্যবসায়ে তাঁর শেয়ার আছে শালিমারের ঘাটে। তাঁর জন্ম সেকালের সীমানায়, একালের শুরুতে। কুস্তিতে শিকারে লাঠিখেলায় ছিলেন ওস্তাদ। পাখোয়াজে নাম ছিল প্রসিদ্ধ। মার্চেন্ট অফ ভেনিস, জুলিয়াস সিজার, হ্যামলেট থেকে দু-চার পাতা মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। মেকলের ইংরেজি ছিল তাঁর আদর্শ, বার্কের বাগ্মিতায় ছিলেন মুগ্ধ, বাংলাভাষায় তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ছিল মেঘনাদবধকাব্য পর্যন্ত। মধ্যবয়সে মদ এবং নিষিদ্ধ ভোজ্যকে আধুনিক চিত্তোৎকর্ষের আবশ্যক অঙ্গ বলে জানতেন, শেষবয়সে ছেড়ে দিয়েছেন। সযত্ন ছিল তাঁর পরিচ্ছদ, সুন্দর গম্ভীর ছিল তাঁর মুখশ্রী, দীর্ঘ বলিষ্ঠ ছিল তাঁর দেহ, মেজাজ ছিল মজলিশি, কোনো প্রার্থী তাঁকে ধরে পড়লে 'না' বলতে জানতেন না। নিষ্ঠা ছিল না পূজার্চনায়, অথচ সেটা সমারোহে প্রচলিত ছিল তাঁর বাড়িতে। সমারোহ দ্বারা কৌলিক মর্যাদা প্রকাশ পেত, পূজাটা ছিল মেয়েদের এবং অন্যদের জন্যে। ইচ্ছে করলে অনায়াসেই রাজা উপাধি পেতে পারতেন; ঔদাস্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে রাজারাম হেসে বলতেন, পিতৃদত্ত রাজোপাধি ভোগ করছেন, তার উপরে অন্য উপাধিকে আসন দিলে সম্মান খর্ব হবে। গবর্মেন্ট্‌ হাউসে তাঁর ছিল বিশেষ দেউড়িতে সম্মানিত প্রবেশিকা। কর্তৃপক্ষীয় পদস্থ

ইংরেজ তাঁর বাড়িতে চিরপ্রচলিত জগদ্ধাত্রীপূজায় শ্যাম্পেন-প্রসাদ ভুরিপরিমাণেই অন্তরস্থ করতেন।

শর্মিলার বিবাহের পরে তাঁর পত্নীহীন ঘরে ছিল বড়ো ছেলে হেমন্ত, আর ছোটো মেয়ে ঊর্মিমালা। ছেলেটিকে অধ্যাপকবর্গ বলতেন দীপ্তিমান, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট্‌। চেহারা ছিল পিছন ফিরে চেয়ে দেখবার মতো। এমন বিষয় ছিল না যাতে বিদ্যা না চড়েছে পরীক্ষামানের ঊর্ধ্বতম মার্কা পর্যন্ত। তা ছাড়া ব্যায়ামের উৎকর্ষে বাপের নাম রাখতে পারবে এমন লক্ষণ প্রবল। বলা বাহুল্য, তার চারি দিকে উৎকণ্ঠিত কন্যামণ্ডলীর কক্ষপ্রদক্ষিণ সবেগে চলছিল, কিন্তু বিবাহে তার মন তখনো উদাসীন। উপস্থিত লক্ষ ছিল য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-সংগ্রহের দিকে। সেই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে ফরাসি জর্মন শেখা শুরু করেছিল।

আর কিছু হাতে না পেয়ে অনাবশ্যক হলেও আইন পড়া যখন আরম্ভ করেছে এমন সময় হেমন্তের অন্ত্রে কিংবা শরীরে কোন্‌ যন্ত্রে কী একটা বিকার ঘটল ডাক্তারেরা কিছুই তার কিনারা পেলেন না। গোপনচারী রোগ সবল দেহে যেন দুর্গের আশ্রয় পেয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া যেমন শক্ত হল তাকে আক্রমণ করাও তেমনি। সেকালের এক ইংরেজ ডাক্তারের উপর রাজারামের ছিল অবিচলিত আস্থা। অস্ত্রচিকিৎসায় লোকটি যশস্বী। রোগীর দেহে সান শুরু করলেন। অস্ত্রব্যবহারের অভ্যাসবশত অনুমান করলেন, দেহের দুর্গম গহনে বিপদ আছে বদ্ধমূল, সেটা উৎপাটনযোগ্য। অস্ত্রের সুকৌশল সাহায্যে স্তর ভেদ করে যেখানটা অনাবৃত্ত হল সেখানে কল্পিত শত্রুও নেই, তার অত্যাচারের চিহ্নও নেই। ভুল শোধরাবার রাস্তা রইল না, ছেলেটি মারা গেল। বাপের মনে বিষম দুঃখ কিছুতেই শান্ত হতে চাইল না। মৃত্যু তাঁকে তত বাজে নি, কিন্তু অমন একটা সজীব সুন্দর বলিষ্ঠ দেহকে এমন করে খণ্ডিত করার স্মৃতিটা দিনরাত তাঁর মনের মধ্যে কালো

হিংস্র পাখির মতো তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইল। মর্ম শোষণ করে টানলে তাঁকে মৃত্যুর মুখে।

নতুন-পাস-করা ডাক্তার, হেমন্তের পূর্বসহাধ্যায়ী, নীরদ মুখুজ্জে ছিল শুশ্রূষার সহায়তা-কাজে। বরাবর জোর করে সে বলে এসেছে, ভুল হচ্ছে। সে নিজে ব্যামোর একটা স্বরূপ নির্ণয় করেছিল, পরামর্শ দিয়েছিল দীর্ঘকাল শুকনো জায়গায় হাওয়া বদল করতে। কিন্তু রাজারামের মনে তাঁদের পৈত্রিক যুগের সংস্কার ছিল অটল। তিনি জানতেন যমের সঙ্গে দুঃসাধ্য লড়াই বাধলে তার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র ইংরেজ ডাক্তার। এই ব্যাপারে নীরদের 'পরে অযথামাত্রায় তাঁর স্নেহ ও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তাঁর ছোটো মেয়ে ঊর্মির অকস্মাৎ মনে হল, এ মানুষটার প্রতিভা অসামান্য। বাবাকে বললে, "দেখো তো বাবা, অল্প বয়স অথচ নিজর 'পরে কী দৃঢ় বিশ্বাস আর অতবড়ো হাড়-চওড়া বিলিতি ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে নিজের মতকে নিঃসংশয়ে প্রচার করতে পারে এমন অসংকুচিত সাহস।"

বাবা বললেন, "ডাক্তারি বিদ্যে কেবল শাস্ত্রগত নয়। কারও কারও মধ্যে থাকে ওটার দুর্লভ দৈব সংস্কার। নীরদের দেখছি তাই।"

এদের ভক্তির শুরু হল একটা ছোটো প্রমাণ নিয়ে, শোকের আঘাতে, পরিতাপের বেদনায়। তার পরে প্রমাণের অপেক্ষা না করে সেটা আপনিই বেড়ে চলল।

রাজারাম একদিন মেয়েকে বললেন, "দেখ্ ঊর্মি, আমি যেন শুনতে পাই, হেমন্ত আমাকে কেবলই ডাকছে, বলছে, 'মানুষের রোগের দুঃখ দূর করো।' স্থির করেছি তার নামে একটা হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করব।"

ঊর্মি তার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "খুব ভালো হবে। আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো য়ুরোপে, ডাক্তারি শিখে ফিরে এসে যেন হাঁসপাতালের ভার নিতে পারি।"

কথাটা রাজারামের হৃদয়ে গিয়ে লাগল। বললেন, "ঐ হাঁসপাতাল হবে দেবত্র সম্পত্তি, তুই হবি সেবায়েত। হেমন্ত বড়ো দুঃখ পেয়ে গেছে, তোকে সে বড়ো ভালোবাসত, তোর এই পুণ্যকাজে পরলোকে সে শান্তি পাবে। তার রোগশয্যায় তুই তো দিনরাত্রি তার সেবা করেছিস, সেই সেবাই তোর হাতে আরো বড়ো হয়ে উঠবে।"

বনেদি ঘরের মেয়ে ডাক্তারি করবে এটাও সৃষ্টিছাড়া বলে বৃদ্ধের মনে হল না। রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো বলতে যে কতখানি বোঝায় আজ সেটা আপন মর্মের মধ্যে বুঝেছেন। তাঁর ছেলে বাঁচে নি, কিন্তু অন্যের ছেলেরা যদি বাঁচে তা হলে যেন তার ক্ষতিপূরণ হয়, তাঁর শোকের লাঘব হতে পারে। মেয়েকে বললেন, "এখানকার য়ুনিভার্সিটিতে বিজ্ঞানের শিক্ষাটা শেষ হয়ে যাক আগে, তার পরে য়ুরোপে।"

এখন থেকে রাজারামের মনে একটা কথা ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে ঐ নীরদ ছেলেটির কথা। একেবারে সোনার টুকরো। যত দেখছেন ততই লাগছে চমৎকার। পাস করেছে বটে, কিন্তু পরীক্ষার তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে গিয়ে ডাক্তারিবিদ্যের সাত সমুদ্রে দিনরাত সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। অল্প বয়েস, অথচ আমোদপ্রমোদ কোনো কিছুতেই টলে না মন। হালের যত- কছু আবিষ্কার তাই আলোচনা করছে উল্‌টে-পাল্‌টে, পরীক্ষা করছে, আর ক্ষতি করছে নিজের পসারের। অত্যন্ত অবজ্ঞা করছে তাদের যাদের পসার জমেছে। বলত, মূর্খেরা লাভ করে উন্নতি, যোগ্য ব্যক্তিরা লাভ করে গৌরব। কথাটা সংগ্রহ করেছে কোনো-একটা বই থেকে।

অবশেষে একদিন রাজারাম ঊর্মিকে বললেন, "ভেবে দেখলুম, আমাদের হাঁসপাতালে তুই নীরদের সঙ্গিনী হয়ে কাজ করলেই কাজটা সম্পূর্ণ হবে, আর আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারব। ওর মতো অমন ছেলে পাব কোথায়।"

রাজারাম আর যাই পারুন হেমন্তের মতকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। সে বলত, মেয়ের পছন্দ উপেক্ষা করে বাপমায়ের পছন্দে বিবাহ ঘটানো বর্বরতা। রাজারাম একদা তর্ক করেছিলেন, বিবাহ ব্যাপারটা শুধু ব্যক্তিগত নয়, তার সঙ্গে সংসার জড়িত, তাই বিবাহে শুধু ইচ্ছার দ্বারা নয় অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হওয়ার দরকার আছে। তর্ক যেমনই করুন, অভিরুচি যেমনই থাক্, হেমন্তের 'পরে তাঁর স্নেহ এত গভীর যে, তার ইচ্ছাই এ পরিবারে জয়ী হল।

নীরদ মুখুজ্জের এ বাড়িতে গতিবিধি ছিল। হেমন্ত ওর নাম দিয়েছিল আউল, অর্থাৎ প্যাঁচা। অর্থ ব্যাখ্যা করতে বললে সে বলত, ও মানুষটা পৌরাণিক, মাইথলজিকাল, ওর বয়েস নেই, কেবল আছে বিদ্যে, তাই আমি ওকে বলি মিনার্ভার বাহন।

নীরদ এদের বাড়িতে মাঝে মাঝে চা খেয়েছে, হেমন্তর সঙ্গে তুমুল তর্ক চালিয়েছে, মনে মনে ঊর্মিকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে, কিন্তু ব্যবহারে করে নি যে তার কারণ, এ ক্ষেত্রে যথোচিত ব্যবহারটাই ওর স্বভাবে নেই। ও আলোচনা করতে পারে, আলাপ করতে জানে না। যৌবনের উত্তাপ ওর মধ্যে যদি-বা থাকে, তার আলোটা নেই। এইজন্যেই, যে-সব যুবকের মধ্যে যৌবনটা যথেষ্ট প্রকাশমান তাদের অবজ্ঞা করেই ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই-সকল কারণে ওকে ঊর্মির উমেদার-শ্রেণীতে গণ্য করতে কেউ সাহস করে নি। অথচ সেই প্রতীয়মান নিরাসক্তিই বর্তমান কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওর 'পরে ঊর্মির শ্রদ্ধাকে সম্ভ্রমের সীমায় টেনে এনেছিল।

রাজরাম যখন স্পষ্ট করেই বললেন যে, যদি মেয়ের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে তবে নীরদের সঙ্গে তার বিবাহ হলে তিনি খুশি হবেন তখন মেয়ে অনুকূল ইঙ্গিতেই মাথাটা নাড়লে। কেবল সেইসঙ্গে জানালে, এ দেশের এবং বিলেতের শিক্ষার পালা সমাধা করে

বিবাহ তার পরিণামে। বাবা বললেন, "সেই কথাই ভালো, কিন্তু পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেলে আর কোনো ভাবনা থাকে না।"

নীরদের সম্মতি পেতে দেরি হয় নি, যদিও তার ভাবে প্রকাশ পেল, উদ্‌বাহবন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ত্যাগ স্বীকার, প্রায় আত্মঘাতের কাছাকাছি। বোধ করি এই দুর্যোগ কথঞ্চিৎ-উপশমের উপায়-স্বরূপে শর্ত রইল যে, পড়াশুনো এবং সকল বিষয়েই নীরদ ঊর্মিকে পরিচালনা করবে, অর্থাৎ ভাবী পত্নী-রূপে ওকে ধীরে ধীরে নিজের হাতে গড়ে তুলবে। সেটাও হবে বৈজ্ঞানিকভাবে, দৃঢ়নিয়ন্ত্রিত নিয়মে, ল্যাবরেটরির অভ্রান্ত প্রক্রিয়ার মতো।

নীরদ ঊর্মিকে বললে, 'পশুপক্ষীরা প্রকৃতির কারখানা থেকে বেরিয়েছে তৈরি জিনিস। কিন্তু মানুষ কাঁচা মালমসলা। স্বয়ং মানুষের উপর ভার তাকে গড়ে তোলা।"

ঊর্মি নম্রভাবে বললে, "আচ্ছা, পরীক্ষা করুন। বাধা পাবেন না।"

নীরদ বললে, "তোমার মধ্যে শক্তি নানাবিধ আছে। তাদের বেঁধে তুলতে হবে তোমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্যের চারি দিকে। তা হলেই তোমার জীবন অর্থ পাবে। বিক্ষিপ্তকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে একটা অভিপ্রায়ের টানে, আঁট হয়ে উঠবে, ডাইনামিক হবে, তবেই সেই একত্বকে বলা যেতে পারবে মরাল অর্গানিজম্‌।"

ঊর্মি পুলকিত হয়ে ভাবলে, অনেক যুবক ওদের চায়ের টেবিলে ওদের টেনিস কোর্টে এসেছে, কিন্তু ভাববার যোগ্য কথা তারা কখনো বলে না, আর-কেউ বললে হাই তোলে। বস্তুত নিরতিশয় গভীরভাবে কথা বলবার একটা ধরন আছে নীরদের। সে যাই বলুক ঊর্মির মনে হয় এর মধ্যে একটা আশ্চর্য তাৎপর্য আছে। অত্যন্ত বেশি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল।

রাজারাম ওঁর বড়ো জামাইকেও ডাকলেন। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে চেষ্টা করলেন পরস্পরকে ভালো করে আলাপ করিয়ে দেবার। শশাঙ্ক শর্মিলাকে বলে, "ছেলেটা অসহ্য জেঠা; ও মনে করে আমরা সবাই ওর ছাত্র, তাও পড়ে আছি শেষ বেঞ্চির শেষ কোণে!"

শর্মিলা হেসে বলে, "ওটা তোমার জেলাসি। কেন, আমার তো ওকে বেশ লাগে।"

শশাঙ্ক বলে, "ছোটো বোনের সঙ্গে ঠাঁই বদল করলে কেমন হয়।"

শর্মিলা বলে, "তা হলে তুমি হয়তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচ, আমার কথা আলাদা।"

শশাঙ্কের প্রতি নীরদেরও যে ভ্রাতৃভাব বেড়ে উঠছে তা মনে হয় না। মনে মনে বলে, 'ও তো মজুর, ও কি বৈজ্ঞানিক। হাত আছে মাথাটা কই।'

শশাঙ্ক নীরদকে নিয়ে তার শ্যালীকে প্রায় ঠাট্টা করে। বলে, "এবার পুরোনো নাম বদলাবার দিন এল।"

"ইংরেজি মতে?"

"না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত মতে।"

"নতুন নামটা শুনি।"

"বিদ্যুৎলতা। নীরদের পছন্দ হবে! ল্যাবরেটরিতে ঐ পদার্থটার সঙ্গে পরিচয় আছে, এবার ঘরে পড়বে বাঁধা।"

মনে মনে বলে, 'সত্যি ঐ নামটাই একে ঠিক মানায় বটে।' ভিতরে ভিতরে একটা খোঁচা লাগে। হায় রে, এতবড়ো প্রিগ্‌টার হাতে পড়বে এমন মেয়ে।' কার হাতে পড়লে যে শশাঙ্কের রুচিতে ঠিক সন্তোষজনক এবং সান্ত্বনাজনক হতে পারত, বলা শক্ত।

অল্পদিনের মধ্যে রাজারামের মৃত্যু হল। ঊর্মির ভাবী স্বত্বাধিকারী নীরদনাথ একাগ্রমনে তার পরিণতি-সাধনের ভার নিলে।

ঊর্মিমালা যতটা দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। তার চঞ্চল দেহে মনের উজ্জ্বলতা ঝল্‌মল্‌ করে বেড়ায়। সকল বিষয়েই তার ঔৎসুক্য। সায়ান্সে যেমন তার মন সাহিত্যে তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। ময়দানে ফুটবল দেখতে যেতে তার অসীম আগ্রহ, সিনেমা দেখাটাকে সে অবজ্ঞা করে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদেশ থেকে এসেছে ফিজিক্সের ব্যাখ্যাকর্তা, সে সভাতেও সে উপস্থিত। রেডিয়োতে কান পাতে, হয়তো বলে 'ছ্যাঃ', কিন্তু কৌতূহলও যথেষ্ট। বিয়ে করতে রাস্তা দিয়ে বর চলেছে বাজনা বাজিয়ে, ও ছুটে আসে বারান্দায়। জুওলজিকালে বারে বারে বেড়িয়ে আসে, ভারি আমোদ লাগে, বিশেষত বাঁদরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে। বাবা যখন মাছ ধরতে যেতেন ছিপ নিয়ে ও তাঁর পাশে গিয়ে বসত। টেনিস খেলে, ব্যাড্‌মিন্টন খেলায় ওস্তাদ। এ-সব দাদার কাছে শিক্ষা। তন্বী সে সঞ্চারিণী লতার মতো, একটু হাওয়াতেই দুলে ওঠে। সাজসজ্জা সহজ এবং পরিপাটি। জানে কেমন করে শাড়িটাতে এখানে ওখানে অল্প একটুখানি টেনেটুনে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ঢিল দিয়ে, আঁট ক'রে অঙ্গশোভা রচনা করতে হয়, অথচ তার রহস্যভেদ করা যায় না। গান ভালো গাইতে জানে না; কিন্তু সেতার বাজায়। সেই সংগীত দেখবার না শোনবার কে জানে। মনে হয় ওর দুরন্ত আঙুলগুলি কোলাহল করছে। কথা কবার বিষয়ের অভাব ঘটে না কখনো, হাসবার জন্যে সংগত কারণের অপেক্ষা করতে হয় না। সঙ্গদান করবার অজস্র ক্ষমতা, যেখানে থাকে সেখানকার ফাঁক ও একলা ভরিয়ে রাখে। কেবল নীরদের কাছে ও হয়ে যায় আর-এক মানুষ, পালের নৌকোর হাওয়া যায় বন্ধ হয়ে, গুণের টানে চলে নম্রমন্থর গমনে।

সবাই বলে, ঊর্মির স্বভাব ওর ভাইয়েরই মতো প্রাণপরিপূর্ণ। ঊর্মি জানে, ওর ভাই ওর মনকে মুক্তি দিয়েছে। হেমন্ত বলত, আমাদের ঘরগুলো এক-একটা ছাঁচ, মাটির মানুষ গড়বার জন্যেই। তাই তো এতকাল ধরে বিদেশী বাজিকর এত সহজে তেত্রিশ কোটি

পুতুলকে নাচিয়ে বেড়িয়েছে। সে বলত, 'আমার যখন সময় আসবে তখন এই সামাজিক পৌত্তলিকতা ভাঙবার জন্যে কালাপাহাড়ি করতে বেরোব।' সময় হল না, কিন্তু ঊর্মির মনকে খুবই সজীব করে রেখে দিয়ে গেছে।

মুশকিল বাধল এই নিয়ে। নীরদের কার্যপ্রণালী অত্যন্ত বিধিবদ্ধ। ঊর্মির জন্যে পাঠ্যপর্যায়ের বাঁধা নিয়ম করে দিলে। ওকে উপদেশ দিয়ে বললে, "দেখো ঊর্মি, মনটাকে পথে চলতে চলতে কেবলই চলকিয়ে ফেলো না, পথের শেষে যখন পৌঁছোবে তখন ঘড়াটাতে বাকি থাকবে কী।"

বলত, "তুমি প্রজাপতির মতো চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াও, কিছুই সংগ্রহ করে আন না। হতে হবে মউমাছির মতো। প্রত্যেক মুহূর্তের হিসেব আছে। জীবনটা তো বিলাসিতা নয়।"

নীরদ সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে শিক্ষাতত্ত্বর বই আনিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে, তাতে এইরকম সব কথা আছে। ওর ভাষাটা বইয়ের ভাষা, কেননা, ওর নিজের সহজ ভাষা নেই। ঊর্মির সন্দেহ রইল না যে সে অপরাধী। মহৎ ব্রত তার, অথচ তার থেকে কথায় কথায় মন আশেপাশে চলে যায়! নিজেকে কেবলই লাঞ্ছিত করে। সামনেই দৃষ্টান্ত রয়েছে নীরদের- কী আশ্চর্য দৃঢ়তা, কী একাগ্র লক্ষ্য, সকলপ্রকার আমোদ-আহ্লাদের প্রতি কী কঠোর বিরুদ্ধতা। ঊর্মির টেবিলে গল্প কিংবা হালকা সাহিত্যের কোনো বই যদি দেখে তবে তখনই সেটা বাজেয়াপ্ত করে দেয়। একদিন বিকেলবেলায় ঊর্মির তদারক করতে এসে শুনলে সে গেছে ইংরেজি নাট্যশালায় সালিভ্যানের মিকাডো অপেরার বৈকালিক অভিনয় দেখবার জন্যে। তার দাদা থাকতে এরকম সুযোগ প্রায় বাদ যেত না। সেদিন নীরদ তাকে যথোচিত তিরস্কার করেছিল। অত্যন্ত গম্ভীর সুরে ইংরেজি

ভাষায় বলেছিল, "দেখো, তোমার দাদার মৃত্যুকে সমস্ত জীবন দিয়ে সার্থক করবার ভার নিয়েছ তুমি। এরই মধ্যে কি তা ভুলতে আরম্ভ করেছ।"

শুনে ঊর্মির অত্যন্ত পরিতাপ লাগল। ভাবলে, 'এ মানুষটার কী অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি। শোকস্মৃতির প্রবলতা সত্যিই তো কমে আসছে- আমি নিজে তা বুঝতে পারি নি। ধিক্‌, এত চাপল্য আমার চরিত্রে।' সতর্ক হতে লাগল, কাপড়-চোপড় থেকে শোভার আভাস পর্যন্ত দূর করলে। শাড়িটা হল মোটা, তার রঙ সব গেল ঘুচে। দেরাজের মধ্যে জমা থাকা সত্ত্বেও চকোলেট খাওয়ার লোভটাকে দিলে ছেড়ে। অবাধ্য মনটাকে খুব কষে বাঁধতে লাগল সংকীর্ণ গণ্ডিতে, শুষ্ক কর্তব্যের খোঁটায়। দিদি তিরস্কার করে, শশাঙ্ক নীরদের উদ্দেশে যে-সব প্রখর বিশেষণ বর্ষণ করে সেগুলোর ভাষা অভিধানবহির্ভূত উগ্র পরদেশীয়, একটুও সুশ্রাব্য নয়।

একটা জায়গায় নীরদের সঙ্গে শশাঙ্কের মেলে। শশাঙ্কের গাল দেবার আবেগ যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন তার ভাষাটা হয় ইংরেজি, নীরদের যখন উপদেশের বিষয়টা হয় অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর ইংরেজিই হয় তার বাহন। নীরদের সব চেয়ে খারাপ লাগে যখন নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে ঊর্মি তার দিদির ওখানে যায়। শুধু যায় তা নয়, যাবার ভারি আগ্রহ। ওদের সঙ্গে ঊর্মির যে আত্মীয়সম্বন্ধ সেটা নীরদের সম্বন্ধকে খণ্ডিত করে।

নীরদ মুখ গম্ভীর করে একদিন ঊর্মিকে বললে, "দেখো ঊর্মি, কিছু মনে কোরো না। কী করব বলো, তোমার সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব আছে, তাই কর্তব্যবোধে অপ্রিয় কথা বলতে হয়। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, শশাঙ্কবাবুদের সঙ্গে সর্বদা মেলামেশা তোমার চরিত্রগঠনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। আত্মীয়তার মোহে তুমি অন্ধ, আমি কিন্তু দুর্গতির সম্ভাবনা সমস্তই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

ঊর্মির চরিত্র বললে যে পদার্থটা বোঝায় অন্তত তার প্রথম বন্ধকী দলিল নীরদেরই সিন্দুকে, সেই চরিত্রের কোথাও কিছু হেরফের হলে লোকসান নীরদেরই। নিষেধের ফলে ভবানীপুর অঞ্চলে ঊর্মির গতিবিধি আজকাল নানাপ্রকার ছুতোয় বিরল হয়ে এসেছে। ঊর্মির এই আত্মশাসন মস্ত একটা ঋণশোধের মতো। ওর জীবনের দায়িত্ব নিয়ে নীরদ যে চিরদিনের মতো নিজের সাধনাকে ভারাক্রান্ত করেছে, বিজ্ঞানতপস্বীর পক্ষে তার চেয়ে আত্ম-অপব্যয় আর কী হতে পারে।

নানা আকর্ষণ থেকে মনকে প্রতিসংহার করবার দুঃখটা ঊর্মির একরকম করে সয়ে আসছে। তবুও থেকে থেকে একটা বেদনা মনে দুর্বার হয়ে ওঠে, সেটাকে চঞ্চলতা বলে সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে না। নীরদ ওকে কেবল চালনাই করে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে ওর সাধনা করে না কেন। এই সাধনার জন্যে ওর মন অপেক্ষা করে থাকে- এই সাধনার অভাবেই ওর হৃদয়ের মাধুর্য পূর্ণবিকাশের দিকে পৌঁছয় না, ওর সকল কর্তব্য নির্জীব নীরস হয়ে পড়ে। এক-একদিন হঠাৎ মনে হয়, যেন নীরদের চোখে একটা আবেশ এসেছে, যেন দেরি নেই, প্রাণের গভীরতম রহস্য এখনই ধরা পড়বে। কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, সেই গভীরের বেদনা যদি বা কোথাও থাকে তার ভাষা নীরদের জানা নেই। বলতে পারে না বলেই বলবার ইচ্ছাকে সে দোষ দেয়। বিচলিত চিত্তকে মূক রেখেই সে যে চলে আসে এটাকে সে আপন শক্তির পরিচয় বলে মনে গর্ব করে। বলে, ‘সেন্টিমেন্টালিটি করা আমার কর্ম নয়।’ ঊর্মির সেদিন কাঁদতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এমনি তার দশা যে সেও ভক্তিভরে মনে করে একেই বলে বীরত্ব। নিজের দুর্বল মনকে তখন নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করতে থাকে। যত চেষ্টাই করুক-না কেন, মাঝে মাঝে এ কথা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একদিন প্রবল শোকের মুখে যে কঠিন কর্তব্য নিজের ইচ্ছায়

সে গ্রহণ করেছিল কালক্রমে নিজের সেই ইচ্ছা দুর্বল হয়ে আসাতে অন্যের ইচ্ছাকেই আঁকড়ে ধরেছে।

নীরদ ওকে স্পষ্ট করেই বলে, "দেখো ঊর্মি, সাধারণ মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যে-সব স্তবস্তুতি প্রত্যাশা করে আমার কাছে তা পাবার সম্ভাবনা নেই, এ কথা জেনে রেখো। আমি তোমাকে যা দেব তা এই-সব বানানো কথার চেয়ে সত্য, ঢের বেশি মূল্যবান।"

ঊর্মি মাথা হেঁট করে চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে, 'এঁর কাছে কি কোনো কথাই লুকোনো থাকবে না।'

কিছুতে মন বাঁধতে পারে না। ছাদের উপর একলা বেড়াতে যায়। অপরাহ্বের আলো ধূসর হয়ে আসে। শহরের উঁচুনিচু নানা আকারের বাড়ির চূড়া পেরিয়ে সূর্য অস্ত যায় দূর গঙ্গার ঘাটে জাহাজগুলোর মাস্তুলের পরপ্রান্তে। নানা রঙের লম্বা লম্বা মেঘের রেখা বেড়া তুলে দেয় দিনের প্রান্তসীমানায়। ক্রমে বেড়া যায় লুপ্ত হয়ে। চাঁদ উঠে আসে গির্জের শিখরের ঊর্ধ্বে; অনতিস্ফুট আলোতে শহর হয়ে আসে স্বপ্নের মতো, যেন অলৌকিক মায়াপুরী। মনে প্রশ্ন ওঠে, সত্যই কি জীবনটা এত অবিচলিত কঠিন। আর, সে কি এত কৃপণ। সে না দেবে ছুটি, না দেবে রস! হঠাৎ মনটা খেপে ওঠে, ইচ্ছে করে অত্যন্ত একটা দুষ্টুমি করতে, চেঁচিয়ে বলতে 'আমি কিচ্ছু মানি নে'।